Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved Journal Serial No. 47694/48666
Volume-VI, Issue-IV, April 2018, Page No. 1-10
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' : ভূমিকা ও শিল্পরূপ

ড. সুশান্ত ঘোষ

Abstract

'Natun Ihudi'- is a very popular stage oriented historical drama was wrote by Salil Sen on 1951. After independent of India and division of Bengal in 1947, the refugee problem grown up in new India. Most of the hindu family suffered from the division and lost their own Land and birth place. Sanskrit language was banned in Pakistan and Hindu People lost Their citizenship in East-Pakistan. A Brahmin Hindu educated and renewed family came to Sealdah Station as a refugee. Family lost their own identity. Here they face identity crisis and a well settled family broken into pieces. Pondit taken a cookery job and he lost his all tradition and culture. Some selfish leader created the situation of their own interest. They hit upon the communal harmony. Common Hindu Muslim people always against the division and partition of Bengal. After division Bengali people lost their soul and soil, lost their motherland and identity. Salit Sen a great dramatist and actor Sketched this scenario in his drama 'Natun Ihudi'.

নাট্যকার সলিল সেন এর মঞ্চসফল 'নতুন ইহুদী' (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের পয়লা মে) নাটকটি গ্রন্থাকারে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলেও তার প্রায় দু বছর পূর্বেই নাটকটি লেখা হয় এবং "উত্তর সারথীর প্রচেষ্টায় পরীক্ষামূলক ভাবে 'নতুন' ইহুদী নাটকটি ১৯৫১ সালের ২১ শে জুন 'কালিকা' রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল"। সুতরাং নাটকটি ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির উজ্জ্বল স্মৃতির মধ্যেই রচনা হয়েছিল। এই সময়ের ইতিহাস প্রেক্ষাপটটি তাই নাটকের বিষয়রূপে বর্তমান হয়েছে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই আগস্ট মধ্যরাতে ভারতবর্ষ বহুকাঙ্খিত স্বাধীনতা লাভ করল। কিন্তু বাংলাও পঞ্জাবের ক্ষেত্রে এ স্বাধীনতা আসলে বিচ্ছিন্নতার আর্তনাদ। সুস্থ শরীর থেকে অঙ্গচ্ছেদের মতোই বাংলা ও পাঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় শুধুমাত্র সম্প্রদায়গত বিচ্ছিন্নতায়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জওহরলাল নেহেরু ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেও সাধারণ মানুষের কাছে বিশেষত বাংলার মানুষের কাছে বিষময় হয়ে উঠেছিল সে স্বাধীনতা। একদিকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দে যখন সমগ্রদেশ আত্মাহারা তখন পূর্ব পাকিস্থানের উদ্বাস্তু হিন্দুদের শোচনীয় অবস্থা সেকালের প্রায় সকল ইতিহাসিক ও সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সবচেয়ে বড় ক্ষত আজও সাধারণ মানুষের মনে যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। পূর্ব পাকিস্থান থেকে দলে দলে চলে আসা মানুষগুলো পরিচয় হারিয়ে ফেলেছিল। একদিকে প্রচণ্ড ক্ষুধা, অন্যদিকে সর্বজন, সমাজ আর্দশ হারানোর তীব্র যন্ত্রণা উদ্বাস্তু মানুষগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিল। একশ্রেণির মানুষের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষের এই যন্ত্রণা ইতিহাসে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

দেশভাগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল সাধারণ ছাপোষা মধ্যবিত্ত শ্রেণি। সবকিছু হারিয়ে বিবেকের কাছে তারা অসহায় হয়ে পড়েছিল। একান্নবর্তী পারিবারিক সম্পর্ক ভেঙ্গে গিয়েছিল, সেই সঙ্গে পুরাতন মূল্যবোধগুলিও বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। উদ্বাস্তুদের এই আর্তনাদের ছবি 'নতুন ইহুদী' নাটকের মূল কথা। বাস্তুচ্যুত, দেশচ্যুত, সমাজচ্যুত, পরিবারচ্যুত এইসব পরিচয়হীন উদ্বাস্তুদেরই 'ইহুদী' বলে তুলনা করেছেন- হিটলারের অত্যাচারিত জার্মানির ইহুদীদের উদ্বাস্তু হবার কাহিনিকে সামনে রেখে। নাট্যকার নিজেও সেকথা স্বীকার করেছেন- "উত্তর সারথী গোষ্ঠীর জন্য লিখলাম নতুন ইহুদী নাটকটা। ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের সমস্যা বেদনা নিয়ে এই নাটক। নামটা ইচ্ছে করে 'নতুন ইহুদী' রেখেছিলাম। কিছুটা প্রতীকী। হিটলারের অত্যাচারে যেমন জার্মানি থেকে ইহুদীদের উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল। ঠিক সেই রকম অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হয় পূর্ব পাকিস্তানে অত্যাচারিত মানুষদের"।[২] সুতরাং নাটকের মূলকথা উদ্বাস্তু সমস্যা। তবে সেই সমস্যা কিভাবে পরিবার হতে ব্যক্তিজীবনে অভিশাপ বয়ে এনেছিল তারই এক অশ্রুসজল মানবিক হৃদয় জিজ্ঞাসায় বেদনার্ত ও করুণ এ নাটক। নাটকটি যেমন মঞ্চসফল তেমনি পাঠ্য হিসাবেও চমৎকার। নাট্যকার একটি মাত্র নাটকে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। সহজবোধ্য অথচ গুরুগম্ভীর এই নাটকটি আসলে নাট্যকারের প্রতিভাকে সমধিক প্রকাশ করতে পেরেছে। নাট্যকার নিজেও সেকথা আমাদের জানিয়েছেন "বলা যেতে পারে 'নতুন ইহুদী' আমার জীবনে একটি উজ্জ্বল দিক হয়ে আছে"।[৩]

'নতুন ইহুদী' নাটকটি নবনাট্য আন্দোলনের ধারায় সুপরিচিত নাটক। নাট্যকার নিজেও এই নাটকটিকে নবনাট্য আন্দোলনের নাটক বলে চিহ্নিত করেছেন। গ্রন্থের পরিচয় অংশে তিনি বলেছেন- "রক্ষণশীল মনোভাবের সমস্ত দ্বিধা ও সঙ্কোচকে অতিক্রম করিয়া নবনাট্য আন্দোলনের দিকে সুধীজনেরা সপ্রসংশ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়"। কংগ্রেসী শাসনকালে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টি সারাদেশে বেআইনি বলে ঘোষিত হয়। গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির যোগ ছিল অচ্ছেদ্য। ফ্যাসী বিরোধিতা থেকে যেদিন গণনাট্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেদিন থেকেই কমিউনিস্ট মতাদর্শেই পরিচালিত হত এই নাট্য সংস্থা। ফলে নিষেধাজ্ঞার কারণে সাময়িক ভাবে স্বাধীন ভারতে গণনাট্য আন্দোলনের ধারা সীমিত হয়ে পড়েছিল যদিও গণনাট্য বেআইনি ঘোষিত হয়নি। এই বছরই শম্ভু মিত্র গণনাট্য থেকে সরে এসে 'বহুরূপী' দল গঠন করলেন। এখান থেকেই সূচনা হল নবানাট্য আন্দোলনের অবশ্য শম্ভু মিত্র সহ অনেকেই মনে করেন নবনাট্য আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ১৯৪৩-৪৪ খ্রিস্টাব্দেই। গণনাট্য আন্দোলনের গর্ভেই নবনাট্য আন্দোলনের সূচনা ঘটেছিল। অমর গঙ্গোপাধ্যায় 'রক্তকরবীর অভিনয়' সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন- "বাংলার বিগত যুগের থিয়েটার প্রীতি 'নবান্ন' যুগের নবনাট্য আন্দোলনের স্তিমিত ধারা নতুন চেতনায় আজ আবার মুখর হয়ে উঠেছে"।[৪] গণনাট্য সংঘ 'শ্রীরঙ্গম মঞ্চে' ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর বিজন ভট্টাচার্য এবং শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় প্রথম অভিনীত হয় 'নবান্ন' নাটকটি। সুতরাং ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দেই যে নবনাট্য আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল সে কথা মেনে নেওয়া যায়। শম্ভু মিত্র নিজেও বলেছেন— "আজ প্রায় দশ-বারো বছর ধরে নবনাট্য আন্দোলনের শুরু করেছি"।[৫] ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি একথা বলেছিলেন, সুতরাং তাঁর মতে নবনাট্য আন্দোলনের সূচনা ঘটে ১৯৪৪ খ্রিঃ হতে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। আমরা ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দকেই নবনাট্য আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ হিসাবে মেনে নিই। নবনাট্য আন্দোলনের লক্ষ্য কী, একথা বলতে গিয়ে গঙ্গাপদ বসু বলেছিলেন-- "মোটামুটি বলা যায় সৎমানুষের নতুন জীবন বোধের এবং নতুন সমাজ ও বলিষ্ঠ জীবন গঠনের মহৎপ্রয়াস যে সুলিখিত নাটকে

শিল্প সুষমায় প্রতিফলিত তাকেই বলতে পারি, নবনাট্যের নাটক এমনি নাটক নিয়ে মঞ্চে সমাজ শিল্পীর সত্য ও রিয়্যালিটির যে অন্বেষণা তাকেই বলতে পারি নাট্য আন্দোলন"।[৬] অর্থাৎ নবনাট্য হবে—

[১] সৎমানুষের নতুন জীবনবোধের নাটক।
[২] নতুন সমাজ ও বলিষ্ঠ জীবন গঠনের মহৎ প্রয়াস থাকবে এখানে।
[৩] নাটকটি সুলিখিত ও শিল্পসুষমায় মণ্ডিত হবে।
[৪] সত্য ও বাস্তবজীবন সমস্যা কেন্দ্রিক হবে এ নাটক।

এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক 'সৎ' বলতে 'বহুরূপী' কী বোঝাতে চাইলেন। আমাদের মনে হয় সৎ কথাটি রাজনীতি বর্জিত নাটককে বোঝাতে চেয়েছেন। চিন্মোহন সোহনবীশ মনে করেন। 'পার্টিজান' ও 'নন পার্টিজানের' মতভেদই গণনাট্য ও নবনাট্যের ভেদ রেখা। এই দুই ভেদে ননপার্টিজানই সফলতা পায়। ফলে রাজনীতির উগ্রতা, মতাদর্শের চেষ্টাকৃত তৈরি - এসব থেকে নবনাট্য দূরে থেকেছে। সেই কারণে তাঁদের প্রকৃতি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। সৎ বলতে তাই "মননচিন্তা আবেগ, দূরবগাহী এবং নাট্যের আদর্শের আহন বলেই মনে হয়। কেননা 'ক্রোধ, দ্বেষ, ঘৃণা, আর অপ্রেম যা দলের সংকীর্ণ স্বার্থের পরিপোষক' তাই নাকী গণনাট্যের মৌলচিন্তা ছিল বলে মনে করেন নবনাট্য গোষ্ঠী। শম্ভু মিত্র সে জন্যই বলেছিলেন— "শ্রেণি বিশেষের বা দল বিশেষের জীবন নয়, সমগ্র জাতির। সমগ্র শ্রেণির সুখ-দুঃখ আশা আনন্দ নিয়ে যে মহৎ জীবন রেখায় রচনা করে রাখছে আমাদের দেশের অনাগত ভবিষ্যতের পটভূমিকা। সেই মহৎ জীবন স্রোতকে বইয়ে দিতে হবে মঞ্চের মাঝখান দিয়ে, সেই স্রোতে দান করতে হবে দর্শকদের।"[৪] সুতরাং মার্কসীয় ধারণার শ্রেণি বিশেষের বা দল বিশেষের চাহিদাকে পিছনে ফেলেই নবনাট্যের পথ চলা। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে পরাধীন ভারতবর্ষে তথা সমগ্র বিশ্বে এক চরম বিশৃঙ্খলতার যুগে গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। নবনাট্য আন্দোলনের সূচনাও যেহেতু এই সময়েতেই সেজন্য জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ঘটনাগুলি নবনাট্য আন্দোলনও প্রত্যক্ষ করেছিল। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে চলা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে আগষ্ট আন্দোলন, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে নৌ-বিদ্রোহ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা-এসবই নবনাট্য আন্দোলনের সমসাময়িক যুগপটভূমি। দেশভাগের ফলে যে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু সৃষ্টি হয়েছিল নবনাট্যগোষ্ঠীর নাট্যকার এই নাটকে সেই সমস্যার কথা বলেছেন। অরাজনৈতিক মতাদর্শ, নাট্যকলার সুনিপুণ গাঢ়ত্বে, সর্বজনীন আবেগের রূপায়ণের উদ্বাস্তু সমাজের পূনর্মূল্যায়নের নতুন ইহুদী একটি নবনাট্যের নাটক হিসাবে সার্থকতা লাভ করেছে। সর্বজনীন মানবরস তৈরিতে এ নাটক তুলনা রহিত। সেজন্যই এই নাটকে অসাম্প্রদায়িক তাৎপর্যে ভালোবাসার তাৎপর্য আবিষ্কার করে আমাদের চমকিত করে মুসলমান দেশের মুসলমান মৌলবীর কথায়—

> *"মোহইন্যা রে, তুই এটা কি কলি? দেশ কথাটা মোহ নারে, দেশ মাইনষের মনে। জমির উপর দেওয়াল তুলছে - মনে যেন তুলতে না পারে। মাইনষেরে অবিশ্বাস করিসনা। ভালোবাসা যেন মাইনষেরে জয় করতে পারস্ এই আশীর্বাদই করি।"*

হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পরিবারের প্রতি মীর্জার এই কাতরোক্তি সহানুভূতির অকৃত্রিম সুরে অনুরণিত। দেশভাগের সময় ও পরও যে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সম্পূর্ণরূপে বজায় ছিল তা মীর্জার এই বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট। এই অরাজনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক পরিচ্ছন্নতা নাটকটিকে বিশিষ্ট করেছে।

'নতুন ইহুদী' একাঙ্ক নাটক হিসাবে সম্পূর্ণ সার্থক। নাটকটি এক অঙ্কে ১৬টি দৃশ্যে সমাপ্ত হয়েছে। নাট্যকার অঙ্কের বদলে ষোলটি দৃশ্যে নাটকটি পরিবেশন করেছেন। একাঙ্ক নাটকের রূপনীতি একান্তভাবেই আধুনিক কালের। একটি মাত্র ঘটনা কেন্দ্রিক একমুখীন দ্রুতগতিময় একঅঙ্কে সমাপ্ত সংক্ষিপ্ত নাটককে একাঙ্ক নাটক বলা যায়। একাঙ্ক নাটকের লক্ষ্য হল দ্রুত Climax বা শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছানো। ছোটগল্পের মতোই এজাতীয় নাটকে চরিত্রের সংখ্যা কম হবে। একাঙ্ক নাটকে সমগ্র জীবনের বিস্তৃত ছবি ফুটিয়ে তোলা যাবে না। চকিত আভাসে তাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। ভাষা প্রয়োগেও পরিমিত ও মিতবাক হতে হবে। স্থান-কাল-পাত্রের ঐক্য থাকবে এবং সংলাপের থাকবে লক্ষ্যভেদী তীক্ষ্ণতা। 'নতুন ইহুদী' নাটকটিতে একাঙ্কিকার সব বৈশিষ্ট্যই পূর্ণমাত্রায় দেখতে পাই। নাটকের সূচনা ঘটেছে তীক্ষ্ণ লক্ষ্যভেদী পরিস্থিতিতে। দেশভাগের পর ব্রাহ্মণ পরিবারের ঘরোয়া রোজনামচার সঙ্গে একরাশ উদ্বেগ ও অসহনীয় প্রকাশ পেয়েছে। যার সূত্রধরে নাট্যকার দ্রুত নাটকের মধ্যে প্রবেশ করেছেন এবং Climax তে পৌঁছে দিয়েছেন। মধ্যবিত্ত হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের বেদনার্ত পরিণতির মধ্য দিয়ে নাটকের শেষ করেছেন। নাটকটি দ্রুতগতিসম্পন্ন হওয়ায় নাটকটির সংলাপও হয়েছে মেদহীন অলঙ্কারহীন তীক্ষ্ণ ভাষা। চরিত্র ও সংলাপের গতি, কাহিনির একমুখীনতা নাটকটিকে একটি সার্থক একাঙ্ক নাটকে পরিণত হয়েছে। Serious বা গুরুগম্ভীর এই নাটকটির কাহিনি উপযুক্ত Dramatic Suspense তৈরি করে নাটকের আবেদনকে অদ্ভুতভাবে লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে।

'নতুন ইহুদী' নাটকটি নিঃসন্দেহে একটি বিষাদান্তক নাটক। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবার কিভাবে এদেশে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এবং মৃত্যুতে যে সংগ্রাম অব্যাহত হল ভবিষ্যত প্রজন্মের সেকথা নাট্য অর্থে বুঝিয়ে দিয়েছেন নাট্যকার। পূর্ব-পাকিস্তানের একটি স্কুলে সংস্কৃত পড়িয়ে স্বচ্ছলভাবে পুত্রকন্যা নিয়ে জীবনযাপন করছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। কিন্তু মুসলমান রাষ্ট্রে সংস্কৃতভাষা নিষিদ্ধ হলে চাকরি হারায় এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। একদিকে জীবিকা হারানোর দুঃসহ যন্ত্রণা অন্যদিকে হিন্দুর প্রতি মুসলমানদের তীব্র অত্যাচার। ধর্মান্তকরণের বিপদ এরই মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে কলকাতায় চলে আসে পণ্ডিত, কিন্তু একদিনের প্রতিষ্ঠাশালী পণ্ডিত আজ নিঃসম্বল, উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল, পরিচয়হীন। জন্মভূমিকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করে আসা ব্রাহ্মণ পরিবার হয়ে গেল নিঃস্ব। কলকাতায় শরণার্থী শিবিরে সেনার উৎপাত, স্বেচ্ছাসেবকদের টহলদারী আরও করুণ করে তুলল হাজার হাজার পরিবারের মতো এই পরিবারটিকে। মূল্যবোধের পরাজয় এই নাটক মৃত্যুর সঙ্গে একার্থক হয়ে উঠেছে। দুর্বৃত্তদের হৃদয়হীন তস্করবৃত্তিও এই উদ্বাস্তুদের রিক্ত নিঃস্ব করে দিয়েছে। ভদ্র শিক্ষিত সন্তান হয়েও দুখিয়া চৌর্যবৃত্তি গ্রহণ করেছে পরিণামে ট্রামে কাটা পড়ে হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। কাজ না পেয়ে পণ্ডিতকে জোগারে ব্রাহ্মণের কাজ করতে হয়েছে। অনাহার ক্লিষ্ট জীবনে একপ্রকার বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। মোহন হকারি করে পেট চালায়। অর্থাভাবে সরলা পরীকে দেহবিক্রি করে গৃহত্যাগী হতে হয় এবং মা'ও শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে চলে যায় পাঁচজনের পরিবারের মধ্যে চারজনই হারিয়ে গেছে চিরতরে। কেবল মোহন এই গভীর শোককে সঙ্গীকরে বেঁচে আছে অসহায়ভাবে। পুরো নাটকটিই করুণ রসে মর্মভেদী। তবে একাঙ্ক নাটকের একটি নাটক তিনটি মৃত্যু ঘটনার চিত্র তুলে ধরা যেন কতকটা Melodrama বা অতিনাটক বলে মনে হতে পারে। একটু গভীরভাবে দেখলে দেখা যাবে এঘটনা বাস্তব কেননা সেদিন এঘটনা অনেক ঘটেছিল। ইতিহাস তার সাক্ষী। মোহনের দৃঢ় কঠিন চরিত্র, উপস্থিত বুদ্ধি নিঃসন্দেহে নায়কের মর্যাদা লাভ করেছে। তবে সে যেহেতু পরিবারের কর্তা নয় তাই ট্রাজেডি ঘটেছে পণ্ডিতেরই। তিনিই এক অনাহত দ্রষ্টা। দেশভাগের ফলে উদ্ভুত সমস্যা তাকে সর্বশ্রান্ত করে মৃত্যুর রাজ্যে নিয়ে গেছে। তার এই মৃত্যু কেবল তাঁর মৃত্যু নয়। পণ্ডিতের

পরাজয় কেবল নাটকের উপাদান তার আসল ভাগ্য নির্ধারণ করেছে সমকালীর মূল্যবোধ ও নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন জনিত সমস্যা। সেই কারণে এই নাটকটি আমরা Tragedy of Incident বা ঘটনামুখ্য ট্রাজেডির তুলনায় আনতে পারি। অবশ্য তাঁর Fate বা নিয়তি তাঁর সৃষ্টি নয়। তাঁর আসল নিয়তি দেশভাগ সমস্যা বহিঃরঙ্গের বিচ্ছেদ যে অন্তরঙ্গে বিষময় পরিণতির সৃষ্টি করেছে তা আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারি। নাটকটি বাস্তব কাহিনি নির্ভর। বাস্তব নাটকের করুণ পরিণতি সত্যিই বিষাদান্তক।

অনেক সময়েই প্রশ্ন উঠতে পারে 'নতুন ইহুদী' ঐতিহাসিক নাটক কিনা? কাহিনির প্রেক্ষাপট নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক, তৎকাল দেশভাগকৃত উদ্বাস্তু সমস্যা ইতিহাসের কাহিনি। ইতিহাসের ফ্রেমে নাট্যকার আসলে মানবপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন, তাই যেটুকু ইতিহাস সেটি শুরু প্রেক্ষাপট তৈরিতে ব্যবহার করেছেন বাকি কাহিনি নাট্যকারের কল্পনার রঙে অনবদ্যতা পেয়েছে। বাস্তব জীবনরক্ষা মানবিক মূল্যবোধ যেভাবে গ্রন্থন করেছেন তাতে নিঃসন্দেহে এটি বাস্তববাদী নাটক, কিন্তু ঐতিহাসিক নাটক নয়। ঐতিহাসিক নাটকের গৌরব এখানে নেই।

সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে অসাধারণ পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার। পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষাকে (উপভাষা) নাটকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। এই নাটকে নাট্যকার তিনপ্রকার ভাষা ব্যবহার করেছেন (১) পূর্ববঙ্গের কথ্য উপভাষা, (২) কোলকাতার মান্যচলিত ভাষা (৩) হিন্দুস্থানী ভাষা। পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষাই এই নাটকের প্রাণ। সলিল সেন যে কথ্য উপভাষা ব্যবহার করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তব। কোথাও তিনি চেষ্টাকৃত স্বাধীনতার আশ্রয় নেননি। চরিত্র অনুযায়ী ভাষার প্রয়োগ করে নাটকের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। তুলসী লাহিড়িও তাঁর 'ছেঁড়া তার' নাটকে পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষায় ব্যবহার করেছিলেন। সলিল সেনের এই ভাষা প্রাণবন্ত ও সজীব। নাটকের শুরুই হয়েছে গৃহস্থ পরিবারের ঘরোয়া আলাপ চারিতার মধ্য দিয়ে। অপূর্ব লাবণ্যে সেই ভাষা সুষমা মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

মা (অন্নপূর্ণা) : পরী, ওলো ওপরী! শোনস্ নি?
পরী (নেপথ্যে) : কি? কওনা। এইত আমি শ্যামারে ফ্যান খাওয়াই।
মা : অখন থো ত – আর গরুরে সোহাগ করতে লাগবো না – বেলার মনে বেলা
যায়-থারা বেবাক্ গেল কৈ? দুইখ্যা, মোহইন্যা-অরা গেল কই
ইস্কুল কি বন্ধ নাকী আইজ?... ইত্যাদি

এ ভাষা একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের ভাষা। উপভাষার সবকটি বৈশিষ্ট্যও এই ভাষায় রয়েছে। অপিনিহিতির বাহুল্য যে বাঙালির বৈশিষ্ট্য সেই উপভাষাতেই এই নাটকটি রচিত। তা ছাড়া মেয়েলি কথ্যরীতিটি এখানে বাস্তবসম্মত ভাবে প্রকাশ করেছেন। ফলে এ ভাষা অকৃত্রিম ও প্রাণের আবেগে উচ্ছল।

মুখের ভাষা তুলে দিয়েছে বলেই বাক্য ব্যবহারকে স্বাভাবিক রেখেছেন। চরিত্রানুযায়ী ভাষার প্রয়োগ অত্যন্ত সফলতা লাভ করেছে। রাগী বদমেজাজী দুইখ্যা প্রতিস্পর্ধীদের সঙ্গে ঝগড়া করার ভাষাও তাই একান্ত বাস্তবতার ভাস্বর।

"দুইখ্যা : বারে! মাছের লেইগ্যা বুঝি কাইজা করছি? অষ্টপ্রহর আমারে ছাগইল্যা বল্‌দা কইরা টালাইতাছে-হেই কেউ দেখে না। জান কিষ্ট ঐ পাড়ার ছেমরা দেইখ্যা, তিন তিনবার কিছু কই নাই, তবু-হেই নি থামে, আমি বলদ আছি বেশ আছি-কোন ইয়ের বাপে

আমার খাওয়ায় শুনি"।

সাধারণ চলিত গ্রাম্য ভাষায় সংলাপটি রচিত হলেও বাপবাপান্ত শব্দও অনায়াসেই চলে এসেছে। কিন্তু এতটুকু অশ্লীলতা কোথাও নেই। মুসলমান মীর্জার ভাষাও প্রচলিত চলিত ভাষারীতিতে অনবদ্যতা লাভ করেছে।

> *"মীর্জাঃ ছিঃ মোহন, মাইয়া – মাইন্ষের মতন দুর্বল হওন কি তর শোভা পায়? আল্লায় যার মঙ্গল চায় তারে দুঃখের মধ্যেই মানুষ করে। মরদদের মতন খাড়া অইয়া ওঠ বাজান। কিন্তু আমার দুঃখ যে, আমার হাত দিয়েই ত্যাগ শেষ সম্বলটুকু গেল। প্রিয়জনের কাফুন চাপা দেওনের মত দেশের টানটুকু আমিই উপলক্ষ হইয়া গুছাইলাম রে বাজান। ত্যাগ কোনই ভাল করতে পারলাম না – এই দুঃখ"।*

এই ভাষা অকৃত্রিম মুখের ভাষা বলে স্বসম্প্রদায় গত ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য এখানে ধরা পড়েছে। আল্লা, কাফুন, মরদ ইত্যাদি শব্দের মাত্রানির্দিষ্ট ব্যবহার সংলাপকে শক্তিশালী করেছে।

হিন্দুস্থানী সংলাপ সৃষ্টিতেও নাট্যকার অনবদ্য প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন। টিটাগর অঞ্চলের জনৈক কুলি ভিকুয়া হিন্দিবলয়ের লোক। সে এই নাটক নিজস্ব ভাষায় কথা বলেছে। যদিও দীর্ঘদিন টিটাগরে থাকার জন্য সেখানকার কথ্য ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। তথাপি উজ্জ্বলতা কমেনি বরং নাট্যকারের বহুমাত্রিক ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা প্রকাশিত হয়েছে।

> ভিখুয়া : ও কিষ্টো! কী হলো জী! ইত্না রোনেকা বাত কেয়া?
> কেষ্ট : আমার তিনশ টাকা ঠকাইয়া নিছে – আর কিনা হইল না।
> ভিখুয়া : বঢ়ি আফশোস্ বঢ়ি আফশোস্। লেকিন বেকার রোঁ রোকে কেয়া
> ফ্যায়দা উঠাও গে?"

প্রকৃত বন্ধুর মতো সান্ত্বনা দিতে গিয়ে হৃদয় নিংড়ানো ভাষায় কথা বলেছে সে। এই সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্য উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হয়েছে অদ্ভুতভাবে।

কলকাতার চলিত ভাষার সংলাপ তৈরিতেও অসাধারণ পারদর্শীতা দেখিয়েছে তিনি। কলকাতার শিক্ষিত যুবক, হালুইকর দেববাবু, গণেশ, মহেন্দ্র, যতীন্দ্র-প্রায় সব অপ্রধান চরিত্রই এই ভাষায় কথা বলেছেন—

(১) "দ্বিতীয় যুবক : ব্রাহ্মণ! বলুনতো ঋগ্বেদের ২৪ শ্লোকে কি বলুন তো কত আব্দে প্রথম বেদ লিখিত হয়? বলুন তো-"

(২) "হালুইকর : রোজ-কার কাজ তো নয়, আজকের একদিনের কাজ! তবে লগনসার বাজার আছে, এ মাসে কিছুদিন কাজ করতে পারেন। কিন্তু ছোটকাজ, তাই আমারও বলতে সংকোচ হচ্ছে"।

(৩) যতীন : তাইতো তুমি কি মনে করলে আমি তোমার কিছু নিয়েছি – আরে ছিঃ ছিঃ। আমারও তো ঘরে মা বোন আছে
আমি কেন তোমার – আরে ছিঃ ছিঃ"।

(৪) মহেন্দ্র : আমি কেষ্টদাসের কাছে শুনেছি, আপনার দাদা স্বদেশী যুগের কর্মী ছিলেন। এবং তিনি জেলেই মারা গেছেন, তাঁর ভাই হয়ে আপনি এ নীচতা কেন মেনে নেবেন? কেন আপনি একটা

সংঘবদ্ধ আন্দোলনকে জয়যুক্ত করবেন না! কেন? একজন আপনার অবস্থার সুযোগ নিয়ে আরেকজনকে বঞ্চিত করবে কেন? কেন?"।

এই মার্জিত ভাষা ব্যবহার নাটকের আবেদনকে আরও শক্তিশালী করেছে। সংলাপের মধ্যে এই তীক্ষ্ণতা, স্বাভাবিকতা, নাটকটিকে সাফল্যদানে সহায়তা করেছে। 'নতুন ইহুদী' নাটকের সূচনা ও সমাপ্তিতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বসুন্ধরা' কবিতার প্রয়োগ করেছেন নাট্যকার। নাট্যকারের কুশলী ভাবনায় এই গানটির প্রয়োগ নাট্যপ্রযোজনার দিকে থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবিভক্ত বাংলাদেশে 'ভায়ের মায়ের' স্নেহের নিবিড়তা ছিল। এই নিবিড়তা যেমন ছিল জীবনে তেমন ছিল সমাজে। তাই দেশভাগের পর আত্মীয়তার সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছে উদ্বাস্তু মানুষেরা। আর তার সূত্রধরেই নাটকের শেষে মোহনের মায়ের মৃত্যুও আসলে সম্পর্কের মৃত্যু, আন্তরিক সম্পর্কের মৃত্যু। পুরাতন মূল্যবোধগুলির অপমৃত্যু। নাটকের গতিময়তার পক্ষে সঙ্গীত অন্তরায় হতে পারে- সে কারণে নাট্যকার নাটকে গান প্রয়োগ করেননি। কিন্তু নাটকের সূচনাও সমাপ্তিতে গানের এই ব্যবহার নাট্য আবেদনকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

সচেতন নাট্যকার নবনাট্যের ধারণাকে মেনে নিয়ে রাজনীতি বা প্রতিক্রিয়াশীল কোন রাজনীতির পক্ষপাতিত্ব করেননি তবে সচেতন ভাবে রাজনৈতিক চরিত্র ও বক্তব্য তুলে ধরে সংঘবদ্ধ শক্তির বিজয়বাণী ঘোষিত হয়েছে। যদিও তা নাটকে গৌণ হয়ে উঠেছে। এ অংশটি না থাকলেও নাটকটির রসাবেদনে কোন ঘাটতি হত না। মহেন্দ্র রাজনৈতিক নেতা সে মোহনকে রাজনৈতিক আদর্শের কথা শোনান। সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের কথা বলে সে—

"মহেন্দ্র *:* নিশ্চয়ই আছে যেমন করে বাস্তুহারারা নিজেদের ক্ষমতার পতিত জমি করেছে দখল। পতিত জায়গায় পত্তন করেছে নিজের ঘরের। সে ঘর ভাঙতে কায়েমী স্বার্থের জুলিমবাজরা গেছে, লাঠিয়াল গেছে, কিন্তু জোর করে যারা নিজেদের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে; তাঁদের কাছে মাথা নীচু করে হটে এসেছে অত্যাচারীর দল। পথের ইঙ্গিত সেই দিকে। সংঘবদ্ধ হোন, নিজেদের দাবি সম্বন্ধে সচেতন হোন। নিজেদের দাবিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন *"।*

মোহনও মহেন্দ্রর কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের একজন হয়ে আন্দোলনে সামিল হয়েছে স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে। কিন্তু নাটকের শেষদৃশ্যে মোহনকে যে অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছে তাতে নাট্যকারের প্রতিষ্ঠান বিরোধী বিপ্লবী সত্ত্বা আমাদের কাছে ধরা না দিয়ে পারে না।

> *"...মনে মনে সমস্ত প্রপীড়িতদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শপথ নাও যে স্বার্থলোভী, অর্থলোলুপ যারা তোমাদের ভাগ্যকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, তাঁদের শাস্তি দেবে। হৃদয়হীন শোষকদের অত্যাচার তুমি আর বরদাস্ত করবে না কিছুতেই।"*

মহেন্দ্র এই আহবান অগ্নিমন্ত্রে পরিশুদ্ধ হয়ে বিপ্লবী, প্রতিবাদী চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু নাটকের মধ্যে কোথাও মোহন বিপ্লব করেনি, প্রতিবাদও করেনি। সুতরাং রাজনৈতিক কোন মতাদর্শ পক্ষপাত দুষ্ট হয়ে ওঠেনি। সেই জন্য এটি প্রতিক্রিয়াশীল নাটক নয়। রাজনৈতিক আবেদনে নাটকটি শেষ হলেও এটি রাজনৈতিক নাটক নয়। 'নতুন ইহুদী' নাটকটি একাঙ্ক নাটক হলেও নাট্যকারের অদ্ভুত প্রতিভায় চরিত্র চিত্রণ অনিন্দ্য সুন্দর সহনীয়তা লাভ করেছে। প্রধান ও অপ্রধান মিলিয়ে এখানে আঠারোটি চরিত্র আছে। প্রায় সব চরিত্রই কোন না কোন ভাবে মূল নাটকীয় সমস্যার সঙ্গে যুক্ত, কেবল ১ম পথচারী যুবক ও ২য় পথচারী যুবক চরিত্রদুটি কোন প্রয়োজন ছিলনা বলে মনে হয়। নাট্যকার শহরে শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের উন্নাসিকতা ও পণ্ডিতের অসহায়তার রূপ দেবার জন্যই এদের নাটকে এনেছেন। হালুইকরের ঔদার্য, গরীব সম্প্রদায়ের

প্রতি মমতা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপর শ্রদ্ধা ক্ষণিকেই নিজস্ব মূল্যবোধগুলির সাবলীলভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে, ফলে মূল্যবোধের পরাজয় সত্ত্বেও বিলুপ্ত না হবার দিকটি উদ্ভাসিত হয়েছে। গুপির মতো পকেটমার, কেষ্টের মতো নমঃশুদ্র চাষী, কেষ্টৈগিন্নির মতো কৃষানী – এই নাটকের অপ্রধান চরিত্র হলেও নিজস্ব গৌরবে নাটকটিকে গৌরবান্বিত করেছে। দেবুবাবু ও তাঁর মোসাহেব ক্ষণিক আভাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি দাগ কেটে যায় মীর্জা মৌলবী যদিও প্রথম দৃশ্য ছাড়া আর কোথাও তাকে দেখা যায়নি নাটকের স্বাভাবিকতা রক্ষার জন্য। কেননা প্রথম দৃশ্যেরই ঘটনা স্থান বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তানে) মৌলবী যেহেতু পাকিস্তান ছেড়ে আসতে পারেনি তাই একটি অঙ্কেই তাঁকে দেখা গেছে। এতে নাট্যকারের কাল ঐক্য ও স্থান ঐক্যের ব্যাপারটি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। মৌলবী মুসলমান হলেও সে খাঁটি মানুষ। শ্রদ্ধা, ভক্তি, সন্তানবাৎসল্যপ্রীতি পরোপচিকীর্ষার মনোবৃত্তি ও দেশপ্রেম, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব তাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। মীর্জা নিজে মুসলমান হলেও দেশভাগ সে চায়নি। তাই সে পণ্ডিতের দুঃসময়ে প্রতিবেশীর যোগ্য কাজটি সে করেছে। নাট্যমঞ্চে প্রথম সে আসে যখন পণ্ডিতের স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। প্রতিবেশীর এই অবস্থায় সে ব্যাকুল হয়ে ডাক্তার ডেকে আনতে চায় – কিন্তু দুইখ্যা জানায় ডাক্তার লাগবে না। তখন আশ্চর্য হয়ে মীর্জা বলেন—"হঃ কিষ্ট ডাক্তার লাগব না-এইটা কয়কি?" – এখানে মীর্জার সহানুভাবতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেশভাগে যে মীর্জার সমর্থন ছিল না তা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। মোহন যখন অনুশোচনা করে দেশভাগের বিরোধীতা করে তখন বুদ্ধিমান মীর্জা সাহেব তা এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করলেও তাঁর কথাতে ফুটে উঠেছে দেশভাগের একরাশ কষ্ট, দুঃখ যন্ত্রণা।

> *"মোহন তরে ত কোনদিন এই কথা কইতে শুনি নাই! চুপকরবে বেটা, আর দুঃখ বাড়াইস্‌না। তুই এই সবে মাথা দিস্‌না। একটুভাব তুই ছাড়া ছাড়া কইলাম তগো পরিবারে দেখনের কেউ নাই। এই সব অতীত ভোল – ভুইল্যা দেখ, কিছু করতে পারস নি।"*

মীর্জা ক্লাসে সংস্কৃত পড়ানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাতে চাকরীটা পণ্ডিতের থেকে যায়। পণ্ডিতের গ্যাচুইটির টাকা সে জোগার করার দায়িত্ব নেয়। মীর্জা শুধু দেশপ্রেমিক নন তিনি প্রতিবাদী। তিনি সমকালীন রাজনীতি স্বজনপোষন, এমনকী ইসলামধর্মের প্রতি কটাক্ষ করতেও পিছপা হয়নি।

> *"মীর্জা : কতবড় দুঃখের কথা, কয় ইস্কুল ফান্ডের টাকা নাই...। থাকব কি কইরারে বেটা! ইস্কুল বিল্ডিং তৈরি করতে নিজের পোলারে দেস ঠিকাদারী – মাছের তেলে মাছ ভাজস্‌! ইস্কুল ফান্ডের টাকায় ইস্কুল হয় একতলা, আর তুই তোলস্‌ দোতলা দালান! সরম নাই একতিল কস্‌ ফান্ডে টাকা নাই। তোবা! তোবা! কথায় কথায় ইসলাম, আর বেহেস্ত দেখাস্‌ মাইনসেরে – আর নিজেরা চাউল, চিনি, কেরোসিন চোরাই বাজারে বিক্রি করস। ইসলামের ছবক্‌ - সুদ খাওয়া গুনা আর তাঁরা টাকা কর্জ দিয়া মাইনষের জবাই কইর‍্যা সুদ খাস, দুঃখার দুঃখ বোঝাস্‌ না, এই নি পাকিস্তান তৈরি...।"*

মীর্জা যে কতবড় মনের মানুষ ছিলেন তা এই বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট। একদিকে বাৎসল্যপ্রীতি অন্যদিকে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা কাতর করেছে তাঁকে। তাই তাঁর শেষতম সংলাপে ধরা পড়েছে দেশ কাল উত্তীর্ণ মানবপ্রেমিক হৃদয়বার্তার অশ্রুসজল রূপটি—

মীর্জা : মোহইন্যারে, তুই এইটা কি বলি? দেশ কথাটা মোহ নারে দেশ মাইনষের মনে। জমির উপর দেওয়াল তুলছে – মনে য্যান তুলতে না পারে। মাইনষেরে অবিশ্বাস করিস্‌না, ভালবাইসা যেন মাইনষেরে জয় করতে পারস্‌ এই আশীর্ব্বাদই করি। আমার মনে তগ লেইগ্যা রইল – কসম খা বেটা, আমার বুক ছুঁইয়া

কসম্ খা-কইয়া যা, তরা আবার ফিরা আবি। আমার পোলায় আর তুই লড়াই না কইরা বাইচা বইরতা থাকবি-আমরে জবান দিয়া যা, কসম্ খাইয়া যা বেটা—

পণ্ডিত মনমোহন চক্রবর্তী প্রকৃতপক্ষে এই কাহিনির নায়ক। তারই জীবন পরিণতির ভয়াবহতা এই নাটকের মুখ্যবিষয়। অবিভক্ত ভারতবর্ষে তিনি সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারত বিভক্ত হয়। পূর্বপাকিস্তানে সংস্কৃত নিষিদ্ধ হওয়ায় চাকুরি হারায় তিনি। মুসলমানদের অত্যাচারে ছিন্নমূল হয়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন। অপাদমস্তক সৎ মানুষ এই পণ্ডিত নানা দূর্বিপাকে বিপর্যস্ত হয়ে যায়, শেষ পর্যন্ত হালুইকরের কাজ করতে বাধ্য হয়। একদিকে অনাহার অন্যদিকে একের পর এক আঘাত তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। সে পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। তাকে এ নাটকের ট্রাজিক নায়ক বলা চলে।

অন্নপূর্ণার চরিত্রটি যথাযথ ও মা চরিত্র হিসাবে সার্থক। একদিকে কঠিন কোমল মাতৃত্ব, অন্যদিকে সজাগ স্ত্রীত্ব তাকে যথার্থ মাতৃচরিত্রের গৌরব এনে দিয়েছে। অখণ্ড ভারতবর্ষে স্বচ্ছল পরিবারের সরল গৃহবধূ ছিন্নমূল হয়ে একের পর এক আঘাতে বিপর্যস্ত হয়েছে তবু সে সব সহ্য করেছে তার পরিণতি আমাদের বেদনার্ত করে।

দুইখ্যা ও মোহন দুজনে দুই বিপরীত চরিত্রের। দুইখ্যা ছিন্নমূল হয়ে ডাকাতে পরিণত হয়েছে, এবং অচিরেই ট্রামে কাটা পড়ে মারা গেছে। কিন্তু শিক্ষিত মার্জিত যুবক মোহন অভাবেও ধৈর্য হারায়নি। হকারি করে সে অতিকষ্ঠে সংসার নির্বাহ করেছে। নাটকের শেষে মহেন্দ্রর হাত ধরে সে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

যতীন উপকারীর ছদ্মবেশে অভাবের সুযোগ নিয়ে পরীকে অন্ধকার জগতে চিরদিনের মতো নিয়ে চলে গেছে। সাধারণ সরল গ্রাম্য মেয়ের পরিণতির এই ভয়ঙ্করতার জন্য দায়ী তৎকালীন সমাজ, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ। এছাড়া মহেন্দ্র, ভিখুয়া, চরিত্রগুলি সংক্ষিপ্ত পরিসরে অসাধারণ বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়েছে।

নাট্যকার এই নাটকের কয়েকটি স্থানে Dramatic Monologue বা নাটকীয় একোক্তি ব্যবহার করেছেন। বিশেষ কোন নাটকীয় মুহুর্তে কোন বিশেষ চরিত্র যখন আত্মকথনের মধ্য দিয়ে নাটকের দ্বন্ধ সৃষ্টি করে তাকে বলে Dramatic Monologue বা নাটকীয় একোক্তি। এই নাটকের কয়েকটি স্থানে নাট্যকার এই নাটকীয় একোক্তির প্রয়োগ করেছেন সুন্দরভাবে। সর্বস্ব হারিয়ে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পণ্ডিত যখন বিয়ে বাড়িতে জোগারে হালুইকরের কাজ নেয় তখন তাকে অপমান করে জনৈক গণেশ। তার ফলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাঁদতে এই স্বগোতোক্তিটি করেছেন। যা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী।

"পণ্ডিত : (বলিতে লাগিলেন) - কত দিন কত লোকের আনন্দ কইরা খাওয়াইছি
খাইতে না পারলে বাইন্ধা দিছি। সেইসব দিন বেশি পুরাণ হয় নাই—
বেশি পুরাণ হয় নাই কিন্তু সেই ছান্দা-সেই অন্ন যে এত চোখের জলে কিনিতে লাগবো ভাবতেও পারি নাই। সেই ভাত যে এত নোনা—
সেই ভাতে যে এত জ্বালা-"

এ এক করুণাখন মর্মস্পর্শী স্বগতোক্তি।

'নতুন ইহুদী' – নাটকটি সলিল সেনের সর্বাধিক জনপ্রিয় নাটক। নবনাট্য রীতির এই নাটকটি একটি ব্যতিক্রমী নাটক হিসাবেই পরিগণিত। নাটকটি চলচিত্রও পরিণত হয়। দীপচাঁদ কাংকারিয়ার প্রযোজনা ও সুনীল সরকারের শিল্প নির্দেশনায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অভিনেতার নাটকটি চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হলেও সেন্সর বোর্ড অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। পরে অবশ্য ১৯৫৩ সালে উজ্জ্বলা, পূরবী উত্তরা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় ছবিটি। পরে পুনরায় অশান্তি বাঁধে See India ব্যানারনিয়ে। নাটকটি নাট্যকারের শক্তিশালী প্রতিভার সাক্ষর বহন করছে। কোন কোন স্থানে ভাষাগত কিছু ত্রুটি থাকলেও শিল্পসার্থক নাটক হিসাবেই এটিকে মানতে হবে। সমকালীন বাস্তব সমস্যার নিরবদ্য রূপদানে, আন্তরিক ঔদার্যে, সর্বোপরি মানবিক বোধ ও জীবনের পূর্ণমূল্যায়নে 'নতুন ইহুদী' সত্যিই প্রতিদ্বন্দ্বী। জনৈক সমালোচকও সেকথা বলেছেন—

"সলিল সেন আর কোন নাটক না লিখলেও 'নতুন ইহুদী'র জন্য বিখ্যাত হয়ে থাকতেন।"

(৮) আমাদেরও মনে হয় সমালোচকের একথা যথার্থ।

উৎস নির্দেশ :

১। পরিচয়, সলিল সেন, 'নতুন ইহুদী' নাটকের কথামুখ, ১লা মে ১৯৫৩
২। 'ফ্ল্যাশব্যক', স্মৃতিচারণ, সাপ্তাহিক বর্তমান, ১৯৯৬ (অনুলিখন রিন্টু চট্টোপাধ্যায়)
৩। ঐ
৪। আমাদের কথা, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, বহুরূপী, মে ১৯৭২
৫। সমস্যার একটি দিক, শম্ভু মিত্র, বহুরূপী, ১৯৫৬
৬। ঘরোয়া, বহুরূপী, নভেম্বর ১৯৬০
৭। অভিনয়, নাটক, মঞ্চ, শম্ভু মিত্র, পৃঃ ১৮
৮। বাংলা নাটক সমীক্ষা, কমল কুমার সান্যাল, ১৯৭৬, পৃঃ ১০৫